বিকল্প শক্তির অভাবে

দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক শক্তি বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে

শাসকগোষ্ঠী যত বেশি উন্নয়নের ঢাক বাজাচ্ছে, সুর ততোই বেসুরো হয়ে জনগণের কানে বাজছে। আকাশে মেঘের ডাক শুনতে শুনতেই ঢাকার রাস্তায় হাঁটুপানি জমে যাচ্ছে। পর্যটন গল্পের শেষ না হতেই পাহাড় ধসে জীবন হানির খবর শোনা যাচ্ছে। অকাল বন্যা প্রতিকারের বাঁধ নির্মাণের টাকা মাটি না ছুঁয়ে পকেট থেকে পকেটে জমাট বাঁধার কারণে হাওরে বোরো ধান নষ্ট, হাওরবাসীর কষ্ট আর দেশের অনিষ্ট সবই সাধিত হয়েছে। আবার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চলতি বছরের ৫ মাসে ব্যবসায়ীগোষ্ঠী সেই চালের দাম অস্থিতিশীল করে ২২ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। দুদক চেয়ারম্যান বললেন, ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারাও জড়িত।

বিদ্যুৎ ব্যাপারীদের জরুরি মুনাফালাভের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ও নানা অনিয়ম–দুর্নীতি দূর না করে ৭ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরও আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা করছে সরকার। বামপন্থিসহ নানা মহলের চাপে ও ব্যাপক গণঅসন্তোষের ভয়ে 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করেছে সরকার।

বাংলাদেশ এখন যেন মৃত্যু উপত্যকা। সড়ক দুর্ঘটনা, রেলে কাটা পড়া, লঞ্চ ডুবি, নিরাপত্তাহীনতায় উঁচু ভবনের নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে নিচে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মারা যাওয়া, কারখানা ধস ও অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক মারা যাওয়া, ব্যাক্তিগত-পারিবারিক কলহ–শত্রুতায় খুন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে বিচার বহির্ভূত খুন, আন্তঃদলীয় কোন্দলে সংঘাত-সংঘর্ষে খুন, ধর্ষণ পরবর্তী খুন এগুলো যেন সীমা ছাড়ানো অসহনীয় বেদনা-যন্ত্রণাকে গা-সহা ও স্বাভাবিক করে ফেলছে।

নদী-খাল, জলাভূমি দখল, খাসজমি–অন্যের বসতভিটা দখল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিট, ভর্তি, দরপত্র কেনাবেচা বাণিজ্য, বস্তিবাসী-হকারদের উপর পুলিশ ও মাস্তান ট্যাক্স, উচ্ছেদ দখল-পুনর্দখল, শিক্ষা-স্বাস্থ্য বাণিজ্যের বিপণীবিতান, আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারীসহ ক্ষমতাবানদের আইন লঙ্ঘনের সামান্য সড়কই নমুনা, ফাঁসির আসামিকে পাগল সাজিয়ে মুক্ত করে আনার ক্ষমতা, শিক্ষক পেটানো, শাসকদলের নিম্নপর্যায়ের নেতাদেরও আজ্ঞাবহ না হলে সরকারি কর্মকর্তার হাজত বাস, মামলা ও গ্রেফতার বাণিজ্য ইত্যাদির পাশাপাশি সুবিধাভোগী তোষামোদকারীদের প্রভুভক্তি সারমেয়কেও হার মানায়। এদের সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী বুর্জোয়া দলগুলো নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ও টিকে থাকতে গিয়ে দেশের রাজনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা গৌরব সবকিছুর অস্তিত্বকেই ভঙ্গুর করে দিয়েছে। ভয়-ভীতি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হতাশা-অবিশ্বাস, আত্মকেন্দ্রিক–মোহগ্রস্ততা, ভোগবাদী উন্মত্ততা, মাদকাসক্ত, অসহিষ্ণু উগ্রতা, বর্ধিষ্ণু সাম্প্রদায়িক মানসিকতা, ক্ষয়িষ্ণু নৈতিকতা, মানবিকতা মূল্যবোধ নীতিহীনতার আস্ফালনে আর্দশবাদিতা কোনঠাসা–এসবই দেখছে মানুষ। প্রতিকারের উপায় খুঁজছে। কে দেবে এর সন্ধান–সমাধান? শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক শক্তিসমূহ যে দুর্যোগ-দুর্ভোগ দশা জনগণের উপর চাপিয়ে রেখেছে রাজনীতির মাধ্যমেই তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এজন্য আমরা ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী দুই মেরুর বাইরে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণের কথা বলেছিলাম কারণ এদের শাসন শোষণের ফলাফলেই এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। এখানে বামপন্থি শক্তি ও উদারনৈতিক শক্তি মোটা দাগে এর বাইরে রয়েছে। আদর্শিক অবস্থানগত পার্থক্য ও অতীত ইতিহাসে প্রত্যেকের নিজস্ব ও জোটবদ্ধ কর্মকাণ্ডের দায়ও রয়েছে তাদের, যা এক ধাক্কাতেই দূর করে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভিন্ন দুটি অবস্থানে দাঁড়িয়ে এক স্বর–এক সুর তোলা সম্ভব ছিল। জনগণের সামনে জনজীবনের সমস্যা নিয়ে দাঁড়ালে জনগণই পথ বাতলে দেয়। জনগণ কাতার বন্দী হয়, গণসমাবেশ গণআন্দোলনের ক্ষেত্র রচনা করে। দেশের গতি কী হবে তার চেয়েও নিজেদের হিসাব নিকাষ যখন বড় হয়ে দেখা দেয়, তখনই রাজনীতি বিপথগামী হয়। অর্থাৎ জনগণের কথা বলে, জনে জনে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়।

জনগণ ক্ষমতার মালিক এই আপ্তবাক্য আওড়াতে আওড়াতেই ব্যক্তিদের বিত্ত সম্পত্তির বর্ধিষ্ণু মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দীনহীন মালিক জনতা অবজ্ঞা, বঞ্চনা–লাঞ্ছনা, শোষণ–পীড়নে সর্বস্বান্ত হয়েও কয়েক বছর পর পর ভোট দিয়ে মালিকানা হস্তান্তরের দলিলে স্বাক্ষর করেন। তাও আবার থাকে জাল-জালিয়াতিতে ভর্তি। যারা নিজেরা যতটা ছাড়তে পারে তারা ততটা সমাজকে দিতে পারে, দশের লাঠি একের বোঝা; দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ; আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—ইত্যাদি কথা এখন মর্মে গাঁথার বাণী নয়। অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়া বিত্তবানদের উপহাস বিনোদনমাত্র! যে বাস্তবতা, যে চেতনা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধে, যে গণঐক্যের শক্তিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তা অবিকল থাকতে পারে না একথা সত্য, তার বিবর্তন পরিবর্তন হবে কিন্তু তা তো হবে উর্ধ্বমুখী। অথচ বাংলাদেশে তা হয়েছে নিম্নমুখী-দ্রুতগামী। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্যও তার আনুষঙ্গিক যে সমস্ত প্রথাপ্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল থাকা দরকার তার সবগুলি উইপোকায় কাটা, ঘুনে ধরা কাঠের আসবাব এর মতো কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে।

বিচার ব্যবস্থা নাক ভাসিয়ে ডুবন্ত দশা থেকে বাঁচার চেষ্টায় লিপ্ত। নির্বাহী শক্তি বিচার বিভাগের সাথে পাঞ্জা লড়ছে, মাস্তানি ভঙ্গিতে ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের সমাজতন্ত্রসহ চার মূলনীতির সাইনবোর্ড লাগানো লুটপাটতন্ত্রের আড়ত-গুদাম লুটের মালে ঠাসা। '৭১-এ ধর্মব্যবসায়ীরা ছিল রাজাকার-যুদ্ধাপরাধী আর ধর্মবিশ্বাসীরা অসাম্প্রদায়িক বন্ধনে ছিল মুক্তিকামী, দেশপ্রেমিক–প্রগতিবাদী। এখন ব্যক্তি রাজাকারদের বিচার করে রাষ্ট্রের গায়ে ঝুলানো হয়েছে তাদের পরা সাম্প্রদায়িক লেবাস। ধর্মের রাজনৈতিক বাণিজ্যকে করা হয়েছে রমরমা। সাম্প্রদায়িকতার উষ্ণ ও শীতল প্রবাহ দুটোই চলছে সমানে সমান। সারা বিশ্বে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যা কিছু একদিন সভ্যতা বিকাশের স্বার্থে আস্তাকুঁড়ে ফেলা হয়েছিল আজ সব কুড়িয়ে-কাঁচিয়ে টেনে আনা হচ্ছে। সাদা বর্ণবাদ, গোষ্ঠীবাদ, ইসলামি মৌলবাদ, হিন্দুত্ববাদ, বৌদ্ধত্ববাদ, খৃস্টানত্ববাদ, ইহুদিবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, নাৎসি-

ফ্যাসি-পুনরুজ্জীবনবাদ, পরিবারতন্ত্র ইত্যাদির বাইরে পুঁজিবাদী দুনিয়াকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এটা বুর্জোয়া শ্রেণি ও তাদের শাসন ব্যবস্থার যেমন চিত্র তেমনি বিশ্বব্যাপী জনগণের সংগ্রামী কাফেলারও রয়েছে ভিন্ন ছবি। এসব কিছুর বিরুদ্ধে দেশে দেশে শ্রমজীবী-পেশাজীবী, বিবেকবান বুদ্ধিজীবীসহ জনগণের লড়াই চলছে; যে চিত্রকে সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত মিডিয়া আড়াল করে রাখে। শাসন-প্রশাসন, রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি যেভাবে চলছে তা আমাদের দেশের জনগণও চায় না–তাঁরা পরিবর্তন চায়।

উপনিবেশিক পাকিস্তান আমলে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের শাসনামলে মহাসমারোহে উন্নয়নের দশক পালন করা হয়েছিল। এক দশকের কথিত উন্নয়ন যে আমাদেরকে কত দশক পিছিয়ে দিয়েছিল তা একাত্তরে অনেক কঠিন মূল্যে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। প্রতিদিন একটা করে সমস্যা আসে, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে না করতে আর একটা ইস্যু হাজির হয়। সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত ক্রিয়াশীলতায় স্থিরলক্ষ্য কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া যাচ্ছে না। যে কারণে জনগণও তাৎক্ষণিকতার বাইরে স্থির সংকল্পে জমাট বাঁধতে পারছে না। এখন তো নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন বাঁচানোর ঢল বাংলাদেশে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, রাশিয়া-চীন, ভারত ও পশ্চিমা শক্তির বাণিজ্যিক স্বার্থ, ভূপ্রাকৃতিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত কারণে রাজনৈতিক সামরিক আধিপত্য বিস্তার, সাগর বাণিজ্য ও শক্তিমানদের মেরুকরণ প্রক্রিয়ার বলি হচ্ছে নিরীহ জনগণ। আমাদের শাসকরা শুনিয়েছেন আমাদের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিশেষ করে ভারত ও চীন এর সাথে। এখন দেখা গেল দোকানদার-খদ্দের সম্পর্ক ছাড়া বাস্তবে বন্ধুত্বের তেমন কোন বন্ধনসূত্র নেই। সমস্যার জটিলতা অনেক গভীর। এমনিতেই সমস্যার ভারে ন্যুয়ে পড়া দশা, তার উপর এই বাড়তি চাপ। ইতিমধ্যেই দ্বি-দলীয় পাল্টাপাল্টি খেলা শুরু হয়েছে। সামনে নির্বাসিত গণতন্ত্রের নির্বাচন। বামপন্থিদের হারিয়ে যাওয়ার ভয় কাটিয়ে আরও সক্রিয়তা যেমন দরকার, তেমনি উদারপন্থি শক্তিসমূহের অলস রাজনীতির মোহ কাটিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে রাস্তায় নামা দরকার। যার যার অবস্থান থেকে একই লক্ষ্য নির্ধারণ করে তৎপরতার মাত্রা যত বাড়ানো যাবে, ততই জনগণের মাঝে আশার মনোভাব জাগবে। নিজেরা কিছু না করে নিষ্ক্রিয়তার দায় জনগণের উপর কিংবা একে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে চলতে থাকলে একসময় বলা সহজ হবে, কিছুই তো হলো না—এখন বুর্জোয়া দুই শিবিরের কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে যা পাওয়া যায় তাই ভালো! আর একদল সবজান্তার মতো বলবেন এটাই তো স্বাভাবিক ছিল এবং আমরা আগে থেকেই জানতাম। ফলে জনগণকে আপাতত সালাম জানিয়ে গুটি সুটি মেরে অস্তিত্ব রক্ষাই শ্রেয় কাজ। বর্তমান বড় কথা নয় ভবিষ্যৎ আমাদের। ভাবপ্রবণ বিপ্লবীদের জন্য এটা নিকট অতীতে আসেনি ভবিষ্যতেও দেখা দেবে—বলা কঠিন। এ বছরই সারা দুনিয়ায় রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ পালিত হচ্ছে। কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে কীভাবে বলশেভিক পার্টি বিপ্লব সফল করেছিল, কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কীভাবে রুশ সমাজতন্ত্র অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল আবার ক্রুশ্চেভ-গর্বাচেভদের সংশোধনবাদী সহজ সমাধান পথে কীভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস ক্রিয়া সাধিত হয়েছে, তার অনুসন্ধান ও শিক্ষাগ্রহণ জরুরি। অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণ এবং সংশোধনবাদের আক্রমণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় এ দুটো শিক্ষাই মানব জাতির তথা আমাদের সামনে আছে। এ শিক্ষা বিফলে যাবে—যদি আমরা আমাদের সমাজের বাস্তবতাকে বৈপ্লবিক বাস্তবতার দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে না পারি, যদি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না পারি। উদারপন্থি ও সুশীল সমাজ যদি ভেবে বসে থাকেন কোন দৈবশক্তি বলে যদি আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় তার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। তাহলে খুবই ভুল হবে, এটা মনে রাখতে হবে যে অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতে হবে। ফলে দৃশ্যমান, আস্থাশীল, সাহসী ও গতিময় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি দিয়েই দ্বি-দলীয় দুর্বৃত্তায়িত দুর্নীতিগ্রস্ত, পরিবারতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্রের অচলায়তন ভাঙতে হবে। এর বিকল্প নেই।